কথাসাহিত্য

বর্ষ ৪১ ষষ্ঠ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৯৬
Vol. 41 No. 6. March, 1990

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

পথে ও পথের প্রান্তে ১
পাঠকের চিঠি ৪

ধারাবাহিক উপন্যাস

মুক্তবিহঙ্গম / গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৯
আলো-আঁধারির অঙ্গনে / শৈবাল চক্রবর্তী ৪৫
সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস ? ৫৬

ধারাবাহিক স্মৃতিকথা

শৈশব-স্মৃতি / অমিয়া চৌধুরাণী ৩০

ভ্রমণকাহিনী

রাঙামাটি ভাঙা দেউল / বিনায়ক ১৪
স্বর্ণালী সিঙ্গাপুর / শঙ্কু মহারাজ ৭০

গল্প

আভিজাত্য / তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪
ভগবানের সমস্যা / প্রকাশচন্দ্র পাল ৩৯
পরিচয় / তনুকা ভৌমিক ৪৫

কবিতা

কলকাতার মানে / প্রভাকর মাঝি ৬
খতিয়ান / বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৪
বহুভাষিতা / কবিরুল ইসলাম ৪৪
স্মৃতি-বিস্মৃতি / তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
জন্মশতবার্ষিকী ক্রোড়পত্র

যৌবনের সুনীতিকুমার / কালিদাস রায় ২
মানুষ সুনীতিকুমার / অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার ৪
শিষ্যের চোখে গুরু / সুকুমার সেন ৮
আচার্য সুনীতিকুমার / শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১০
শিল্পী ও শিল্পরসিক / পরিমল গোস্বামী ১১
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও সুনীতিকুমার / রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ১৪
একটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ / প্রমথনাথ বিশী ২১
দুর্লভ মানুষ সুনীতিকুমার / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩

... ...

প্রবন্ধ

মধুসূদনের জন্মসনতারিখ / ডঃ নরেশচন্দ্র জানা ২৬

সমালোচনা

গ্রন্থজিজ্ঞাসা / অন্নদাশঙ্কর রায়, বারিদবরণ ঘোষ ৬৬

বিবিধ

পত্র-পত্রিকা / অনুতোষ ঘোষ ৭
বিচিত্র অভিজ্ঞতা / তুষার গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী ৭৬

বর্তমান সংখ্যার দাম ৪·০০। গ্রাহক মূল্য বার্ষিক ৫০·০০

কার্যালয় : কথাসাহিত্য, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ ফোন : ৩২৫০৫৪, ৩১৬৪২০
Office : Katha Sahitya, 10 Shyama Charan De Street, Calcutta-73, Phone : 325054, 316420

পরিচয়

তনুজা ভৌমিক

গড়িয়াহাটে বাস থেকে নেমে তাড়াহুড়ো করে আমার বাঁধা দোকান 'নন্দিতা'-র দিকে এগোচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, এ মাসে কি একটা সিল্কই কিনব, নাকি ভাল দেখে একটা তাঁতের শাড়ি? ভাগ্যিস ব্যাঙ্কের চাকরিতে মোটা মাইনে; প্রত্যেক মাসে মাইনে পাবার পর একটা করে শাড়ি কেনার অভ্যেসটা বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে হাঁটছি, এমন সময় সামনের একটা দোকান থেকে দেখি, বেরিয়ে আসছেন দুই মহিলা। কাছে আসতে চমকে উঠলাম: আরে প্রতিমা না! সঙ্গের মহিলা কে—হ্যাঁ, বাণীদিই তো! অবাক হওয়া সত্ত্বেও একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে গেলাম দুজনের দিকে। বাণীদি মনে হল আমাকে চিনতে পারেননি, এত বছরের তফাতে না চেনা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু প্রতিমা, আমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমাকে দেখেও না দেখে অন্যদিকে এগিয়ে গিয়ে একটা মারুতিতে উঠল। পিছন পিছন উঠলেন বাণীদি।

পথের বাঁকে মারুতি অদৃশ্য হয়ে গেল আর হাঁ করে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। এ ক'বছরে প্রতিমা এত পালটে গেছে! বছরতিনেক আগেও যে আমাদের বাড়িতে রোজ আসত, সে আজ রাস্তায় আমাকে দেখে চিনতেই পারল না! ভীষণ অপমানিত বোধ করছিলাম। শাড়িটাড়ি কেনা মাথায় উঠল। উল্টোপথে হাঁটা দিলাম বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে।

কালো মুখ করে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে মিতা, অফিসে কোন গণ্ডগোল হয়েছে?'

'না, মা।' ছোট্ট উত্তর দিলাম আমি।

'তবে কি শরীর খারাপ লাগছে? তোর মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন?'

মার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন এড়াতে পারলাম না। প্রতিমার সঙ্গে আচমকা দেখা হওয়ার বৃত্তান্ত বললাম। মা সব শুনে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'না রে মিতা, প্রতিমাকে এতদিন দেখেছি, ওর স্বভাব অন্যরকম। ও ইচ্ছে করে তোকে এরকম আঘাত দেবে না।'

'তবে আমাকে না-চেনার ভান করল কেন? তাছাড়া মিথ্যে কথাই বা বলেছিল কেন? যে বাণীদিকে চেনে না, এক্ষুনি দেখলাম দিব্যি দুজনে এক গাড়িতে গিয়ে উঠল!'

'প্রতিমা নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে ওরকম করেনি। কোন একটা গণ্ডগোল আছে কোথাও। এখন যা, শাড়ি ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে আয়, আমি চা করে দিই। দেখবি, হয়ত কাল সকালেই প্রতিমা এসে হাজির হবে তোর রাগ ভাঙাতে।'

মার কথায় উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার খেয়ে একটু টিভির সামনে বসলাম। কিন্তু ঐ বসাই সার হল, পর্দায় চোখ দুটো রাখা থাকলেও মন চলে গেল অতীতে।

ইউনিভারসিটিতে পড়তে গিয়ে প্রতিমার সঙ্গে আলাপ। প্রতিমাকে লোকে একডাকে সুন্দরী বলবে। ফর্সা রংয়ের সঙ্গে টিকোলো নাক, বাঁকানো ভুরুর নীচে আশ্চর্য স্বপ্নিল দুটি চোখ। এম. এস-সি. পড়ার গোড়ার দিকে অবশ্য প্রতিমাকে একটু এড়িয়ে চলতাম। কিভাবে জানি না, আমাদের ক্লাসের মেয়েদের ধারণা জন্মেছিল যে সৌন্দর্য আর বুদ্ধি হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারে না। ক্লাসের ছেলেরা অবশ্য এ ধারণা জন্মানোর জন্য কিছুটা দায়ী। পড়াশুনোয় ক্লাসের সেরা ছাত্র অভীক তো সরাসরিই বলল একদিন—'আরে প্রতিমা একটা পুতুল। আ বিউটিফুল ডল। মাথা ওর একেবারে ফাঁকা।'

ঘটনাচক্রে একদিন প্রতিমার সঙ্গে ভালভাবে আলাপ হয়ে গেল। আমরা দুজনেই ছিলাম দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। একদিন ইউনিভারসিটি থেকে বাড়ি ফিরছি একই বাসে, ও আমার কয়েকটা সিট পিছনে বসেছিল, হঠাৎ দেখি কাঁচুমাচু মুখ করে আমার পাশে ফাঁকা সিটটায় এসে বসল।

'শোন্ মৈত্রেয়ী, আমায় একটু হেল্প্ করতে পারবি?

হঠাৎ দেখছি যে পার্সে একটা কুড়ি টাকার নোট ছাড়া আর খুচরো নেই। কণ্ডাক্টার ভাঙিয়ে দিতে চাইছে না। তোর কাছে যদি থাকে···আমি কালই তোকে দিয়ে দেব।'

'নো প্রবলেম। আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোকে শোধ দিতে হবে না।'

ওর ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। এদিকে মনে মনে ভাবছি, এতটা পথ আমার পাশে বসে যাবে, বয়ফ্রেণ্ডদের গল্প বলে বিরক্ত করবে না তো?

অল্পক্ষণ বাদে প্রতিমা আবার কথোপকথন চালু করল—'তুই তো কি একটা ফিল্ম-ক্লাবের মেম্বার, না?'

'হ্যাঁ, সাউথ ক্যালকাটা ফিল্ম্ সোসাইটি।'

'বেশ ভাল ভাল বই দেখায়, না?'

'হ্যাঁ। অবশ্য তোর ও ধরনের বই ভাল লাগবে কিনা জানি না।' অহঙ্কারের রেশ এসে গেল আমার গলায়।

প্রতিমা বোধহয় নিজের রুচির সার্টিফিকেট দেখাতেই জিজ্ঞেস করল, 'গত রোববার গ্লোবে মর্নিং শোয় ফারেনহাইট ফোর-ফিফ্‌টি-ওয়ান দেখিয়েছিল—তুই গিয়েছিলি?'

'না রে, যেতে পারিনি—কাজে আটকে গেছিলাম। তুই দেখেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ, দারুণ লাগল। পার্টিকুলারলি একটা বই পোড়ানোর সিন আছে···'

'সেটার কথা শুনেছি। আমি অবশ্য ত্রুফোর 'ডে ফর নাইট' দেখলাম গত মাসে। মন্দ লাগেনি।'

ব্যস্, শুরু হয়ে গেল আড্ডা। গল্প করতে করতে বাকি পথটা কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলাম না। এর পর থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিমা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। বুদ্ধির প্রখরতা এবং সুরুচির পরিচয় ছাড়াও নানা বিষয়ে প্রতিমার জ্ঞান যে গভীর, তা কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলাম। ওর একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব ভাল লাগত—তা হল নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে ওর উদাসীনতা। উদাসীনতা বললে ভুল বলা হবে, বরং বলা যায় নিজের চেহারা সম্বন্ধে একটা অনীহা ছিল ওর, যেন এই সৌন্দর্য ওর জীবনে অনেক দুঃখের কারণ। এ কথা স্পষ্ট করে না বললেও ওর কথার ফাঁকে আভাস পেতাম। প্রতিমার সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হওয়ার সূত্রে ক্লাসের ছেলেদেরও মুখোশ খুলে গেল। অধিকাংশ ছেলে যে কারণে কোন মেয়ের নিন্দা করে, অন্তীক ও অন্ত কিছু ছেলে যে সেই আঙুর ফল টক লাগার কারণেই প্রতিমার সম্বন্ধে যা-তা রটাচ্ছে, তা বুঝতে বাকি রইল না।

প্রতিমার সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি আমার মনে হয়েছিল যে কোথায় যেন ওকে দেখেছি। পরিচিত কারোর সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য তো ছিলই, তাছাড়া ওর হাবভাব, কথা বলার ধরন যেন আমার অনেক দিনের চেনা। অথচ স্মৃতির ভাঁড়ার হাতড়েও কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না কার সঙ্গে ওর এই মিল।

হঠাৎ একদিন মনে পড়ে গেল। আমাদের প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা তখন সবে শেষ হয়েছে। পরিষ্কার মনে আছে দৃশ্যটা। প্রতিমা আর আমি আমাদের বাড়ির ছাদে বসে গল্প করছি। সূর্য ডোবার ঠিক আগের মুহূর্তের লালচে আভায় পশ্চিমের আকাশ রাঙানো। সেই লালের ছোঁয়া লেগেছে প্রতিমার ফর্সা মুখে, কাঁচা-হলুদ শাড়িতে। মরা আলোর বিষাদ কিন্তু কিভাবে যেন আমাদেরও স্পর্শ করেছে—কিছুক্ষণ আগের কলহাস্য তখন মৌনতায় পর্যবসিত। আচ্ছন্নের মত আমরা তাকিয়ে আছি পশ্চিমের লাল আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের দিকে। হঠাৎ প্রতিমা মৃদু গলায় বলে উঠল, 'লেট আস গো দেন ইউ অ্যাণ্ড আই, ওহ্‌য়ের দ্য ইভনিং ইজ স্প্রেড আউট অ্যাগেন্‌স্ট্ দ্য স্কাই···'

এলিয়টের কবিতার লাইন ক'খানা শুনেই মাথার ভিতরে স্মৃতির পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল আর একটি মুখ—বাণীদি। চিৎকার করে উঠলাম, 'প্রতিমা, মনে পড়েছে! জানিস, আমাদের স্কুলে ইংলিশের একজন টিচার ছিলেন, বাণীদি। তোর সঙ্গে কথায়বার্তায়, মুখের আদলে অনেক মিল আছে।'

প্রতিমা আমার আবিষ্কারকে বিশেষ আমল দিল না, 'হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকেরই নাকি একটা করে ডাব্‌ল্ থাকে, জানিস তো? যাক গে, আপাততঃ বল্, এলিয়টের এই কবিতাটা পড়েছিস নিশ্চয়ই?'

'পড়িনি মানে! সেইজন্যই তো 'বাণীদি' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। ক্লাস নাইন-টেনে উনি আমাদের ইংলিশ পড়াতেন।' প্রতিমাকে জোর করে বাণীদির গল্প শুনিয়ে চললাম। 'উনিই প্রথম আমাদের এলিয়টের কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

৭

দেন। অসাধারণ টিচার ছিলেন। মহিলা হিসাবেও দারুণ।'

'বাবাঃ, তুই তো তোর বাণীদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এতদিন ওঁর কথা ভুলে ছিলি কি করে?'

'না রে ইয়ার্কি নয়, সত্যি গল্প করার মত চরিত্র। আমাদের ক্লাসে প্রায় সব মেয়েই বাণীদির ফ্যান ছিল। মনে মনে সবাই আমরা ওঁর মত হতে চাইতাম। যেমন চেহারা, তেমনি গুণ আর বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ ছিল ওঁর হাঁটা-চলায়, কথা বলায়। শুধু ব্যক্তিত্ব কেন, কত গুণী ছিলেন বাণীদি। ইংরেজী সাহিত্যে আমার নেশা ধরানোর মূলে উনিই। আমাদের অনেকের রুচি তৈরী করে দিয়েছিলেন ঐ সময়ে। এতসব তো আছেই, এর উপর আবার সাক্‌সেসফুল গৃহিণী—আর কি চাই, বল্?'

'তাই তো অবাক লাগছে, এরকম একজন আদর্শ মহিলাকে এতদিন ভুলে ছিলি কি করে?'

'আমারও অবাক লাগছে। আসলে কি হয় জানিস, স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে বাইরে বেরোলে পৃথিবীটা এক লাফে এন্‌লার্জ্‌ড্‌ হয়ে যায়, তখন দশ বছরের ভয়-ভালবাসা-শ্রদ্ধা সব যেন কোথায় হারিয়ে যায়। যে সব টিচারদের দেখলে স্কুলে ভয়ে কাঁপতাম, তাঁদেরই পথেঘাটে দেখে অবাক লেগেছে। মনে হয়েছে, আরে এঁর ভয়ে এরকম জুজু হয়ে থাকতাম! বাণীদিকেও হয়ত এখন সামনে দেখলে অবাক হয়ে যাব এই ভেবে যে মনে মনে ওঁকে এত শ্রদ্ধা করে এসেছি। তবে এখনও মনের মধ্যে বাণীদির একটা উজ্জ্বল ছবি আছে—সেটা মাঝে-মধ্যে ঝাপসা হলেও আছে ঠিকই।'

প্রতিমা এর মধ্যে একটু উসখুস করছিল। বুঝলাম বাণীদির প্রসঙ্গটাকে একটু বেশী টেনে ফেলেছি। কাজেই বললাম, 'যাই হোক, বাণীদির কথা মনে পড়ে মনের খচ্‌-খচানি তো গেল। এখন নীচে চল্, মা হয়ত কিছু খেতে দেবে বলে অপেক্ষা করছে।'

প্রতিমা ব্যস্ত হয়ে শাড়ি-টাড়ি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'বলবি তো আগে, মাসীমাকে মিছিমিছি বসিয়ে রাখলাম। তুই দারুণ লাকি, মৈত্রেয়ী। মাসীমার রান্নার হাত যা ভাল! অবশ্য আমার মাও খারাপ রাঁধে না, বিশেষ করে কতগুলো ক্যাল্সি রান্না দারুণ রাঁধে। দাঁড়া, এবার একদিন ঠিক তোকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব। মুশকিল হল, কাজের চাপে এত ব্যস্ত থাকে, একদম সময় পায় না।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবছিলাম, সে-দিন কখনও এলে হয়। প্রতিমা নিজে ঘন ঘন আমাদের বাড়িতে আসত। অনেকদিন ক্লাসের পর এসে গল্পসল্প করে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ নিজের বাড়িতে ফিরত। অথচ এত-দিনের মধ্যে একদিনও আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যায়নি। বাড়িতে ওর বাবা-মা এবং ভাই জয়ের গল্প ওর মুখে অনেক শুনেছি। প্রায়ই বলত, আমাকে ফর্সা বলছিস কি রে, আমার মায়ের রঙ দেখলে চমকে যাবি। দুধে-আলতায় মেশানো রঙ যাকে বলে, ঠিক তাই। এত রেসপন্‌সিবল্ একটা পোস্টে চাকরি করে, তাই ঘোরাঘুরিও কম করতে হয় না, কিন্তু মার চেহারার উপর তা ছাপ ফেলতে পারেনি।' প্রতিমার বাবা নাকি একটা বড় মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর উঁচুপদে আছেন—কর্মব্যস্ত তিনিও। ছোটভাই জয় ক্লাস ইলেভ্‌নের ছাত্র। ওকে নিয়ে প্রতিমার অনেক আশা। 'ও যে লাইনেই যাক, দেখবি শাইন করবে। আমাদের সাবজেক্ট নিতে ওকে বারণ করেছি; জিওলজিতে আজকাল কোন স্কোপ নেই, চাকরি পাওয়া যায় না। বরং ইকনমিক্সে বা কম্পিউটার লাইনে গেলে পরে সুবিধে হবে।'

এত গল্প শুনে সকলকে দেখার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আলাপ করিয়ে দেবার সময় আর প্রতিমার হয়ে উঠত না—'খুব ইচ্ছে আছে, তোকে একদিন মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। কিন্তু ভাখ না, মার সময়ই হয় না। অফিসের টুর লেগেই আছে—আজ দিল্লী কাল বম্বে। কলকাতায় থাকলেও বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত নটা বেজে যায়। দেখিস না, এখান থেকে আমি এত রাত করে বাড়ি ফিরি? বাড়ি ফাঁকা থাকলে গিয়ে ভাল লাগে, বল্? অবশ্য রাত্তিরে আড্ডা দিয়ে সেটাকে পুষিয়ে নিই।'

প্রতিমার এই রহস্যাবৃত দিকটা মনে মনে মেনে নিয়েছিলাম। সেদিন বাণীদির প্রসঙ্গ ওঠাতে আবার নতুন করে কৌতূহলের উদ্রেক হল। তবে কি বাণীদির সঙ্গে প্রতিমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে? সেদিন প্রতিমা বাড়ি ফিরে যাবার পর বিছানায় শুয়ে বাণীদির কথা ভাবছিলাম।

আমাদের ক্লাস নাইনে প্রথম যখন পড়াতে এলেন, তখন

ক্লাসের সব মেয়েই বাণীদির রূপে-গুণে মুগ্ধ। সবাই চেষ্টা করত কোন না কোন ভাবে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার। ক্লাসের অন্য মেয়েদের তুলনায় ইংলিশের উপর আমার দখল ছিল একটু বেশী। তার জোরেই একদিন বাজীমাৎ করে ফেললাম। সাহিত্যে পড়া প্রিয় চরিত্র সম্বন্ধে একটা রচনা লিখেছিলাম 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট'-এর নায়ক র‍্যাসকলনিভকে কেন্দ্র করে। রচনা পড়ে বাণীদি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। আমাকে ডেকে বললেন টিফিনের সময়ে টিচার্স-রুমে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

টিচার্স-রুমে অনেকক্ষণ ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বললেন বাণীদি—কত লেখক, কত কবিদের কথা সেই প্রথম শুনলাম। এরপর প্রায়ই নানা বিষয় নিয়ে ওঁর সঙ্গে গল্প হত। বয়সও কম ছিল বাণীদির—বছর পঁয়ত্রিশের কাছে, যদিও দেখে মনে হত পঁচিশের উপরে নয়—অতএব শিক্ষিকা-ছাত্রীর মধ্যে যে দূরত্ব থাকে সেটাও অনেকটা চলে গেছিল।

বাড়ির গল্প করতেন; বিশেষতঃ ওঁর ছেলের গল্প খুবই করতেন। মনে আছে, একদিন ছেলেকে স্কুলে নিয়ে এসেছিলেন; সেদিন বোধহয় প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে স্কুলের ফাংশন ছিল। স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখি টিচার্স-রুমের সামনে বাণীদিকে ঘিরে জটলা। সাদা সিল্কের শাড়িতে দেবীপ্রতিমার মত দেখাচ্ছিল বাণীদিকে। দেখলাম ওঁর হাত ধরে রয়েছে বছর নয়েকের ফুটফুটে একটি ছেলে। বুঝতে অসুবিধা হল না, ওটাই ওঁর ছেলে সঞ্জয়।

ক্লাস টেনের শেষদিকে হঠাৎ গুজব শুনলাম যে বাণীদি নাকি চলে যাচ্ছেন। উনি নিজেই একদিন বললেন যে আর দু'সপ্তাহ বাদে উনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। কোন কারণ বললেন না। আমার তখন টেস্ট সামনে, পড়ার চিন্তা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা আর মনে দাগ কাটছে না। টেস্ট শেষ হয়ে দেখতে দেখতে মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেল। তার পরে উপর্যুপরি পরীক্ষার আক্রমণে বাণীদির কথা মনের কোন্ কোণে তলিয়ে গেল; ইচ্ছে থাকলেও আর যোগাযোগ করা হয়ে উঠল না।

সেই বাণীদির সঙ্গে প্রতিমার চেহারায় হাবভাবের এত মিল—আশ্চর্য! যাই হোক, কার সঙ্গে প্রতিমার মিল এই ভাবনার কাঁটা থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

দেখতে দেখতে আরও দেড় বছর কেটে গেল। এম. এস্-সি-র শেষ সেমেস্টারের পরীক্ষা-অন্তে যে যার ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েছি। যাবতীয় বিজ্ঞাপনের উত্তরে চাকরির জন্য দরখাস্ত করছি আর বাড়িতে বসে কমপিটিটিভ পরীক্ষাগুলোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। প্রতিমার ইচ্ছে অবশ্য অন্যরকম—ও পি. এইচ. ডি. করবে। অতএব আমাদের জোড়ের বাঁধন কিছুটা আলগা হয়ে গেল। তখন আমাদের মাসে দু'মাসে একবার দেখা হয়। হঠাৎ একদিন জি. পি. ও.তে দেখা। হালকা গোলাপী শাড়িতে স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল প্রতিমাকে। আমাকে দেখেই হাসিমুখে এগিয়ে এল, 'কি রে, কি খবর? তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না!'

'তুই তো অনেকদিন আসিস না।' আমি পাল্টা অভিযোগ করলাম। হঠাৎ খেয়াল করে দেখি, আমার মত ওর হাতেও একতাড়া চিঠি। হেসে ফেললাম দুজনেই। হাসতে হাসতে বললাম, 'অ্যাপ্লিকেশান দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেল!'

'আর বলিস না। জি. পি. ও-র কাউন্টারে প্রত্যেকটা লোকের মুখ চেনা হয়ে গেছে।'

কাজ সেরে এসপ্ল্যানেডে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম আমরা। প্রায় দু মাস বাদে দেখা, অনেক কথা জমেছিল। ঘণ্টাখানেক বক্‌বক্ করার পর স্বাভাবিক ভাবেই বিয়ের প্রসঙ্গ উঠল। আমাদের ক্লাসের তিন-চারজন মেয়ের এরই মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে, কয়েকজনের বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রে, বিয়ে-টিয়ে করার ইচ্ছে নেই? তোর মত সুন্দরী বউ তো যে কেউ লুফে নেবে!'

'আচ্ছা মৈত্রেয়ী, তোর কি সত্যি মনে হয় যে আমি সম্বন্ধ করে কোন বড়লোক ছেলেকে বিয়ে করব আর পটের বিবি সেজে সারাজীবনটা কাটিয়ে দেব?'

ওর গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করে আমিও কথাটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবলাম।

'না, তুই ঠিকই বলেছিস। কিন্তু তুই বিয়েকে একটা কেরিয়ার হিসেবে ভাবছিস কেন? চাকরি করেও বিয়ে করতে

পারিস। আর সম্বন্ধ করে বিয়ে করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। এখনও হয়ত কাউকে সেরকম তোর মনে ধরেনি, কিন্তু কালই হয়ত এমন কারোর সঙ্গে পরিচয় হবে, যার সঙ্গে তুই নিজেই সংসার করতে চাইবি!'

'হতে পারে, কিন্তু মনে হয় না। বিয়ের উপর আমার কোন মোহ নেই। তুই জানিস না মৈত্রেয়ী, এক এক সময় আমার এত রেস্টলেস লাগে! মনে হয় জীবনটা কিভাবে নষ্ট করছি! কত কিছু চেষ্টা করলাম, সোশ্যাল ওয়ার্ক, রিলিজিয়ন…'

বাধা দিয়ে বললাম, 'সোশ্যাল ওয়ার্কে জড়িয়ে পড়েছিলি জানি, আবার কয়েক মাস বাদে ছেড়েও দিলি। কিন্তু গুরু ধরা? সেটা কবে হল?'

প্রতিমা হেসে বলল, 'ইচ্ছে করেই তোকে বলিনি। জানি তুই ধর্ম মানিস না, শুনলে হয়ত হাসিঠাট্টা করবি। আমার এক বন্ধু—রিনাকে তো তুই দেখেছিস—আমাকে এক গুরুমার কাছে নিয়ে গেছিল। কিছুদিন খুব শান্তি পেয়েছিলাম সেখানে।'

'তারপর?'

'তারপর দেখলাম যে গুরুমার আশ্রমেও অশান্তির হাত থেকে রেহাই নেই। হঠাৎ বিদেশী ভক্তদের আনাগোনা বেড়ে গেল, তারপরে মনে হত যে ধর্মের তুলনায় টাকা-পয়সার খেলাটাই বড় হয়ে উঠেছে। এখানে-ওখানে বড়লোক ভক্তদের বাড়িতে বিরাট সমাবেশ আর প্রসাদের বহর দেখলে তুই হাঁ হয়ে যাবি। পুরো ব্যাপারটা একটা শো মনে হতে লাগল। ব্যাস্, যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এখন ভাবছি, পড়াশুনোটা আফটার অল এখনও ভালবাসি। যদি পি. এইচ. ডি. করি, পড়ার মধ্যে গিয়ে ডুবে গিয়ে হয়ত কিছুটা শান্তি পাব।'

প্রতিমার মনের অশান্তির কারণটা অনুমান করতে পারছিলাম না। হঠাৎ খেয়াল হল যে, এতক্ষণে ও নিজের বাড়ির সম্বন্ধে একটাও কথা বলেনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর বাড়ির খবর কি? তুই পড়তে বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবছিস, এত দূরে যেতে দিতে মাসীমা-মেসোমশাইয়ের কোন আপত্তি নেই?'

অন্যমনস্কভাবে প্রতিমা উত্তর দিল, 'বাবার সেরকম মনখারাপ হবে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ কোনরকম আপত্তি করেনি। মা তো কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। কিন্তু অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়াশুনোটা ভালভাবে হয়—মাকে সেটাই রোজ বোঝাচ্ছি। অফ কোর্স আমি চলে গেলে সবচেয়ে বেশী খারাপ লাগবে জয়ের।'

'তোর ভাই এখন কি করছে?'

'ও ইকনমিক্স্ পড়ছে। বলা যায় না, গ্র্যাজুয়েশনের পর হয়ত ও-ও অ্যামেরিকায় চলে যাবে। আমি চেষ্টা করব যাতে আমার ইউনিভার্সিটিতেই আসতে পারে। অবশ্য আমি এমনভাবে বলছি যেন আমি অ্যামেরিকায় গিয়ে বসে আছি। দেখবি হয়ত সবকটা ইউনিভার্সিটি আমায় রিজেক্ট করেছে।'

তা অবশ্য হয়নি। প্রতিমা বেশ ভাল এক ইউনিভার্সিটিতে শুধু অ্যাডমিশনই পেল না, পুরো আর্থিক সাহায্যও পেল। কলকাতার পিছুটান কাটিয়ে উঠে ও উড়ে গেল বিদেশের পথে। আমি বছরখানেকের মধ্যে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসারের চাকরি পেয়ে গেলাম। অতএব আমার শিকড় গাড়া রইল কলকাতাতেই। প্রতিমা কলকাতা ছাড়ার পর প্রথমদিকে চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। তারপর যা হয়, এক বছরের মধ্যে চিঠির সংখ্যা কমতে কমতে এসে দাঁড়াল শূন্যে। ওর সঙ্গে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ঘটনাটা মনে পড়ায় মন তিক্ততায় ভরে গেল। খুব বেশীদিন তো হয়নি, বড়জোর তিন বছর হবে। এরই মধ্যে প্রতিমা আমার চেহারা অবধি ভুলে গেল! যত ভাবছি, ততই অবিশ্বাস্য লাগছে। শূন্য দৃষ্টিতে টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ ভাইয়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরল।

'দিদি, মা খেতে ডাকছে। তাড়াতাড়ি আয়, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

শুতে যাওয়ার সময় মার কথাটা মনে পড়ল, 'দেখবি, হয়ত কাল সকালেই প্রতিমা এসে হাজির হবে তোর রাগ ভাঙাতে।'

মার কথাই ঠিক। পরের দিন ছুটি ছিল—অফিস যাবার তাড়া নেই, একটু বেলা অবধি বিছানায় গড়াচ্ছি। এমন সময় মা এসে খবর দিলেন, 'মিতা, প্রতিমা এসেছে। এবার

তো বিছানা ছাড়বি ?'

'ওকে বলে দাও আমার শরীর খারাপ···' কথা শেষ হবার আগেই দেখি মার পিছনে প্রতিমা এসে উপস্থিত।

গম্ভীর মুখে বললাম, 'আয়, বোস্।'

মা পাকা কূটনীতিকের মত আমাদের দুজনকে ঘরে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। প্রতিমা কোন ভনিতা না করেই বলল, 'আমার উপর খুব চটে আছিস, না ? ভাবছিস, প্রতিমা স্টেট্‌সে গিয়ে এত পাল্টে গেল ? শোন্, কালকে ওভাবে চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না!'

'কিন্তু কেন ? তাছাড়া বাণীদি···'

'হ্যাঁ, ঐ জন্যই। তোর বাণীদি সঙ্গে থাকাতেই মুশকিল হয়েছিল। তোর হাজারটা প্রশ্নের উত্তর ওখানে দিতে হত আমাকে, যা আমি এড়াতে চাইছিলাম।'

'বাণীদিকে তাহলে তুই চিনিস ?'

প্রতিমা একটু অদ্ভুত হেসে আমার দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, ভালভাবেই চিনি। উনি আমার মা।'

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু তুই তো একবারও বলিসনি!'

'কারণ ছিল।'

'তাছাড়া বাণীদিও তো কোনদিন বলেননি ওঁর কোন মেয়ে আছে ? শুধু ওঁর ছেলে সঞ্জয়ের কথা বলতেন।'

'হ্যাঁ, কাজেই বুঝতে পারছিস! জয়কে সবার কাছে নিজের ছেলে বলে গর্ব করে দেখাতেন, কিন্তু আমি যে আছি, ওঁর বড় মেয়ে, সে কথাটা পারলে এড়িয়ে যেতেন।' প্রতিমার স্বরে বেদনার চেয়ে তিক্ততা বেশী—'অবশ্য বেশ কয়েক বছর ধরে সেটুকু ভান করারও দরকার হয়নি। ডিভোর্সটা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই···'

'কি বলছিস তুই ? তোর বাবা-মার ডিভোর্স হয়ে গেছে ? তুই অ্যামেরিকায় থাকতে ?'

'না না, অনেকদিন আগে। আমি তখন ক্লাস টুয়েল্‌ভে পড়ি।' আমার হতভম্ব মুখ দেখে প্রতিমা আবার সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসল। 'ভাবছিস বোধহয়, প্রতিমা কি একটা গল্প ফেঁদে বসল! না রে, আমি যা বলছি সব সত্যি। তোকে এম. এস-সি. পড়ার সময়ে বরং কিছু মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আমাদের বাড়িতে থাকতাম শুধু বাবা আর আমি। সেইজন্যই বাড়ি ফিরতে চাইতাম না। মিথ্যে কথাগুলো বানিয়ে বলতাম কারণ তোদের পরিবারটা এত জড়ানো, তোদের সকলের মধ্যে এত মিল—তার পাশে আমাদের ছন্নছাড়া পরিবারের কথা বলতে কিরকম অস্বস্তি লাগত। বিশ্বাস করতে চাইতাম যে আমাদের বাড়িটাও তোদের মত।'

'আর বাণীদি ?'

'তোর বাণীদি তাঁর ছেলে জয় এবং নতুন স্বামীর সঙ্গে অন্য জায়গায় থাকতেন। ইন ফ্যাক্ট্ আমার মা যখন তোর স্কুলে পড়াত, তখন বাবা-মার মধ্যে অশান্তি চরমে। আমাকে নিয়ে মার অশান্তি তো ছিলই।'

'তোকে নিয়ে অশান্তি মানে ?'

'আমি সব কথা খুলে বললে তুই কি বিশ্বাস করবি ? জানি না। যাই হোক, জানতেই যখন চাস তখন বলছি। আমার মা আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।'

'কিন্তু কেন ?'

'কারণটা সম্ভবতঃ এই যে, আমি বয়সে ওঁর থেকে ছোট আর একটু বেশী সুন্দরী। বিশ্বাস করবি তুই কথাটা ?'

প্রতিমা ওর মার কথা বলে চলেছে আর আমি আমার চেনা বাণীদির মুখের সঙ্গে সেই চরিত্র মেলাবার চেষ্টা করছি।

'আমি এতদিন তোকে কিছু বলিনি, কারণ তুই শুনলে ভাবতিস আমি পাগল। কালকে যখন ওরকম একটা সিচুয়েশন হল, তখন ঠিক করলাম যে ব্যাপারটা খুলে বলব, নইলে একটা বিশ্রী ভুল-বোঝাবুঝি থেকে যাবে। আমি তো জানি, তুই আমাকে কতটা ভালবাসিস! যে জিনিসটা বাড়িতে আমি খুব কমই পেয়েছি—একমাত্র জয়ের কাছ ছাড়া, বাবা সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত, ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেবার বিশেষ সময় পেতেন না। তাও বলব, টাকাপয়সা দিয়ে আমাকে বড় করেছেন, সবরকম সুযোগ-সুবিধে পেয়েছি, আর বাবার মনটা খারাপ নয়। একটু নিস্পৃহ। আমি যে আছি সেটা মাঝে-মধ্যেই ভুলে যান। মার চরিত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম।

ছোটবেলায় মা আমাকে বেশ ভালবাসত। ক্লাস ফাইভ-সিক্স অবধিও মার কাছে অনেক আদর পেয়েছি। তারপর যত বড় হতে লাগলাম, মা যেন ধীরে ধীরে আমার শত্রু হয়ে

উঠল। বাড়িতে লোকজন এলে আমার চেহারার প্রশংসা করত—অনেকেই বলত, 'প্রতিমা বড় হলে বাণীর চেয়েও বেশী সুন্দরী হবে।' শুনে মার মুখটা কালো হয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে প্রায় সন্ধ্যাবেলাই বসার ঘরে বিরাট মজলিস বসত, যার মধ্যমণি ছিল মা। বাবার সাধারণতঃ কাজের চাপে রাত নটার আগে বাড়ি ফেরা হত না, অতএব মজলিসে যোগ দিতেন দেরি করে। মনে আছে, মা খুব সেজেগুজে এসে বড় সোফাটায় বসত। অন্য সকলের মত আমিও মার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম—এত সুন্দর লাগত মাকে দেখতে!

কিন্তু আমি যত বড় হচ্ছিলাম, তত সেই সব আসরে মাকে ছেড়ে অতিথিরা আমার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করল। তারপর থেকে দেখতাম, আমি একটু ভাল জামাকাপড় পরলে মা কারণে-অকারণে আমাকে বকুনি দিচ্ছে। একদিন বলল, 'এটা কি সাজগোজ করার বয়স? এদিকে স্কুলে দিন-দিন রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে! পড়ার নাম নেই, খালি রংচং মেখে বড় সাজার চেষ্টা!' মাকে খুশী করার জন্য আমি খুব সাধারণভাবে থাকতাম—বেশী রঙচঙে জামা পরতাম না, যাতে মার মেজাজ ঠিক থাকে। এর পর রোজকার বসার ঘরের আড্ডায় আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। তাও মুখ বুঁজে মেনে নিলাম; সব সময় আশা থাকত যে, মার কথামত চললে হয়ত মা একটু ভালবাসবে। তারপর যখন দেখলাম যে জয়কে মা অন্য যে কোন মায়ের মতই ভালবাসে. অথচ আমাকে যেন কোনমতেই সহ্য করতে পারে না, তখন ধীরে ধীরে কারণটা বুঝলাম।

জয় কখনও মার কম্পিটিটর হবে না, অতএব ওর কাছ থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমি তো প্রতি মুহূর্তে মাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে মার থেকেও সুন্দরী আরও কেউ আছে। আমার বয়স কম, ওদিকে প্রতি বছর মার চামড়া আর একটু কুঁচকে যাচ্ছে, মাথায় হয়ত দু'একটা সাদা চুল উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। আমি সঙ্গে থাকলে আর সকলের কাছে মার বয়সটাও সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যায়। কসমেটিক্স্ দিয়ে বয়সকে কতদিন আটকে রাখা যাবে! সৌন্দর্যের পূজারী যারা, তারা শীগগিরই মাকে ছেড়ে আমার দিকে ঝুঁকবে। অতএব আমার বিরুদ্ধে মার জেহাদ—আমি নেই, এরকম ভান করলেই হয়ত আমার অস্তিত্বকে পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়া যাবে।'

প্রতিমার কথা শুনেও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না যে ওর জীবনের একটা একতরফা বিবরণ শুনছি আমি। বাণীদি যদি সত্যিই ওর মা হন, তবে তাঁরও স্বপক্ষে বলার কিছু থাকতে পারে। প্রতিমা হয়ত মায়ের অনেক আচরণকে ভুল বুঝেছে, নিজের মনগড়া ধারণার বশবর্তী হয়ে সাদামাটা কথার জটিল অর্থ করেছে। তাছাড়া প্রতিমার কথাকেই বা সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি কেন? এম. এস-সি. পড়তে যে নিজের মায়ের সম্বন্ধে, নিজের পরিবারের সম্বন্ধে এত কথা বানিয়ে বলেছে, আজ সে হঠাৎ সত্যের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে, সেটা ভাবাও ঠিক নয়। অবিশ্বাসের ভাব বোধহয় আমার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল, কারণ প্রতিমা ওর বক্তব্যের জের টেনে বলল, 'দাঁড়া, আমার গল্প এখনও শেষ হয়নি।

ইতিমধ্যে আমার মার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের আলাপ হয় যিনি খুব ঘন ঘন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। পেশায় উকিল এই ভদ্রলোককে নিয়ে বাবা আর মার মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তি শুরু হয়। অশান্তি অবশ্য আগে থেকেই ছিল, এবার তা চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে বাবা-মা আলাদা হয়ে যাবে। জয় তখন ছোট, ডিভোর্স সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই, কিন্তু আমার মনে সেই দিনগুলোর স্মৃতি দগ্‌দগে। রোজ ভাবছি, আমার ভবিষ্যৎ কি হবে, পড়াশুনো কিভাবে করব, কার কাছে থাকব—কত রকম চিন্তা মাথায়। ডিভোর্স পাকাপাকি হবার পর একটা ঘটনা ঘটল যেটা শুনলে তুই বুঝতে পারবি যে আমার কথা-গুলো পাগলের প্রলাপ নয়—মার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা ঠিক।

ছেলেমেয়েদের কাস্টডি নেবার সময়ে মা পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে আমার দায়িত্ব মা নিতে চায় না, শুধু জয়ের দায়িত্ব নিতে চায়। বিশ্বাস কর্ মৈত্রেয়ী, কথাটা শোনার পর থেকে আমি ভেতরে ভেতরে একেবারে ভেঙে গেছিলাম। এতদিন পর্যন্ত একটা ক্ষীণ আশা মনের কোণে লুকিয়েছিল যে বাইরে দুর্ব্যবহার করলেও মনে মনে মা নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসে। কিন্তু ঐ কথার পর নিজেকে ঠকানোর আর কোন রাস্তাই

খোলা রইল না। তারপর ডিভোর্স হয়ে গেল—মা আর জয় অন্য বাড়িতে চলে গেল, বাবা আর আমি পুরনো বাড়িতে রয়ে গেলাম।

জয়ের সঙ্গে বরাবর আমার যোগাযোগ আছে—ওকে আমি খুব ভালবাসি, ওরও আমার উপর একটা টান আছে। মা ভদ্রতাবশতঃ বছরে কয়েকবার আমার সঙ্গে দেখা করত। এখন বোধহয় আমাকে ততটা ভয় পায় না, আগের তুলনায় সহ্য করতে পারে। চোখের সামনে আর থাকি না তো, এত হাজার কিলোমিটার দূরে বসে কিই বা ক্ষতি করতে পারব! এবার তাই দেশে ফেরার পর নিজেই ডেকে কেনাকাটা করতে দোকানে নিয়ে গেল। সেদিন তোর সঙ্গে দেখা…'

প্রতিমা বলে চলেছে আর আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল রঙে বাণীদির মুখ আঁকা সেই ক্যানভাসটা ছুরিতে ফালা-ফালা হয়ে যাচ্ছে। ছবিটাও যেন বদলাতে আরম্ভ করেছে। মুখের চামড়া ধীরে ধীরে কুঁচকে যাচ্ছে, চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, চোয়ালটা যেন একটু ঝুলে পড়েছে। মাথার সামনের দিকটায় একগোছা পাকা চুল না? আরও ভয়ঙ্কর, চোখের চাউনিটা কিরকম লোভী আর ক্রূর হয়ে উঠেছে। অথচ সব মিলিয়ে মুখটা যেন অতি সাধারণ, মাঝবয়েসী এক মহিলার—সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে যে ক্লান্ত। আমি কি তবে বাণীদিকে এবার সত্যি সত্যি চিনতে পারছি? নাকি প্রতিমার কল্পনাপ্রসূত কোন কাহিনী শুনে এক নিষ্পাপ মহিলার প্রতি মনে মনে অন্যায় করছি? বুঝতে পারছি না, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমা তখনও বলে চলেছে ওর গল্প আর আমি মনে মনে চিৎকার করে বলছি, প্রতিমা, তুই চুপ কর্, তুই চুপ কর্!

আলো-আঁধারির অঙ্গনে

[৪৭ পৃষ্ঠার পর]

কিছুটা গান শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার রেশ থেকে যাওয়ার মত। তটিনী সেইরকম মানুষদের একজন।

ঘরে এসে নিজের আসনে চুপ করে বসে থাকে নবীনমাধব। সামনে আয়করের জরুরী কাগজপত্র তবু তাতে মন দেওয়ার প্রবৃত্তি নেই যেন।

ভৃত্য রাম এসে ডাক দেওয়ায় সাড় ভাঙে নবীনমাধবের। রাম বলে, 'বাবু, সরকারমশাই এসেছেন। আমি একবার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছি। ওঁকে কি পরে আসতে বলব?'

'না।' একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে নবীনমাধব নিজের অজান্তে, 'আমি যাচ্ছি ওঁর কাছে। এই কাগজপত্রগুলো তুলে রাখো তো আলমারীতে।'

[ক্রমশঃ]